আনন্দবাজার পত্রিকা

২০ আশ্বিন ১৪২২ বুধবার ৭ অক্টোবর ২০১৫

প্রবন্ধ ১

অর্থনৈতিক উন্নয়নই সংরক্ষণের লক্ষ্য নয়

মোদী সরকারের প্রায় দেড় বছর হতে চলল। এখন অবধি উল্লেখযোগ্য কোনও অর্থনৈতিক সংস্কার রূপায়িত হয়নি, অর্থনীতির পালেও হাওয়া লাগেনি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের কিছু মৌলিক ফাটল ক্রমশই দৃশ্যমান হয়ে পড়ছে। সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলন এরই উপসর্গ।

মৈত্রীশ ঘটক

হার্দিক পটেলের নেতৃত্বে গুজরাতে পটেল সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলন তাঁদের এককালীন হৃদয়সম্রাট নরেন্দ্র মোদীর বেশ হৃদয়পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে ভারতের রাজনীতিতে সংরক্ষণ একটি পুরনো ভূত, যা মাঝে মাঝেই ঢেলা মারতে শুরু করে।

ভারতের সংবিধানে গোড়া থেকেই তফসিলি জাতি এবং জনজাতিদের জন্যে সরকারি চাকরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ শতাংশ এবং ৭.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। পরবর্তী কালে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট যখন গৃহীত হয়, সামাজিক ও শিক্ষাগত ভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণি, যাকে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি (ওবিসি) বলা হয়, তাঁদের জন্যে এর ওপরে ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়।

তফশিলী জাতি এবং জনজাতিদের জন্যে সংরক্ষণ জনসংখ্যার মোটামুটি আনুপাতিক। ওবিসি-দের উপস্থিতি বর্তমান জনসংখ্যার অনুপাতে কতটা সেটা নিয়ে খানিক বিতর্ক আছে । মন্ডল কমিশনে ধরা হয়েছিল তা ৫২%, কিন্তু তার ভিত্তি ছিল ১৯৩১ সালের আদমসুমারি । এই অনুপাত আন্দাজ ৪১% মত ধরা হয় । যে হিসেবই নিই, তাঁদের সংরক্ষরণের মাত্রা আনুপাতিক হারে খানিকটা কম, কারণ তাঁদের মধ্যে যত জাতি তারা সবাই শিক্ষাগত ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর নয় । তাই তাঁদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ নিঃশর্ত নয় - তাঁদের পরিবার আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হলে সংরক্ষরণের সুযোগ পাওয়া যাবেনা। অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (মুসলিম, খ্রিষ্টান, এবং শিখ) কিছু জাতিও অন্তর্ভুক্ত ।

তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং ওবিসি-রা একত্র ভাবে অনগ্রসর শ্রেণি, সামগ্রিক জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। এঁদের জন্য ৪৯.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। লোকসভার আসনও তফসিলি জাতি এবং জনজাতিদের জন্য (ওবিসি-দের জন্য নয়) তুলনীয় অনুপাতে সংরক্ষিত।

প্রথমেই একটা ভুল ধারণা দূর করা উচিত। সামাজিক বা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা যাই তার মাপকাঠি হোক না কেন, সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য বা দারিদ্র বা বেকারত্ব দূর করা সম্ভব নয় । এই সমস্যাগুলোর যে মাত্রা, তাতে চাইলেও সংরক্ষণ নীতি দিয়ে তাতে দাঁত ফোটানো মুশকিল। প্রতি বছর গড়ে যত সরকারি চাকরির পদ খালি হয়, তা দেশের সমস্ত নথিভুক্ত শিক্ষিত বেকারের মাত্র এক শতাংশের মতো। শুধু তা-ই নয়, উচ্চশিক্ষার জন্যে উপযুক্ত বয়সের যে জনসংখ্যা (প্রায় চোদ্দো কোটি), তাদের মাত্র ২০% সরকারি বা বেসরকারি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসেবে নথিভুক্ত। তাই সংরক্ষণ নীতি দিয়ে অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার প্রসারে খুব একটা প্রভাব ফেলা মুশকিল।

সংরক্ষণ নীতির প্রবর্তকরা এই সব বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁদের কাছে সংরক্ষণ ছিল সরকারি ক্ষমতার অলিন্দে প্রান্তিক গোষ্ঠীদের উপস্থিতি জোরদার করার একটি আবশ্যক পদক্ষেপ। এর ফলে শাসনযন্ত্র অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের প্রয়োজনের প্রতি আরও সংবেদনশীল হবে এবং সেই শ্রেণির মানুষের মধ্যে আস্থা জন্মাবে যে, এই দেশের শাসনব্যবস্থায় তাঁরাও অন্তত কিছু মাত্রায় অংশীদার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংরক্ষণ ছাড়া সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণি থেকে যোগ্য প্রার্থী যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যাবে না, তাই সংরক্ষণ নীতি শুধু সরকারি চাকরি নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও চালু থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, ভারতে সংরক্ষণ নীতির মূল উদ্দেশ্যটি রাজনৈতিক এবং সামাজিক। এর ফলে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়লে, সামাজিক বৈষম্যের প্রকোপ কমলে, এবং অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে শিক্ষিত এলিট একটি গোষ্ঠী বাকিদের আত্মোন্নতির জন্যে অনুপ্রেরণা জোগালে পরোক্ষ ভাবে তাতে অনগ্রসর শ্রেণির অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে, এটাই ছিল লক্ষ্য। প্রত্যক্ষ ভাবে অনগ্রসর শ্রেণির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পাদন কিন্তু সংরক্ষণের ঘোষিত উদ্দেশ্য নয়।

শুধু তা-ই নয়। সংরক্ষণ নীতির প্রবর্তকরা এ বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন যে এই নীতি থেকে সর্বাধিক উপকৃত হবেন অনগ্রসর শ্রেণির সচ্ছলতম অংশগুলি। মণ্ডল কমিশন রিপোর্টে যেমন পরিষ্কার বলা আছে, সংরক্ষণ নীতির ফলে অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে সমতা বাড়বে না, সমাজের আর বাকি সব অংশে যেমন হয়, এই অংশেও অর্থনৈতিক সুযোগ প্রায় সব সময়েই সচ্ছলতর মানুষেরাই কুক্ষিগত করবেন।

সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার পিছনে মূল কারণ অবশ্যই আমাদের জাতপাত ব্যবস্থার অন্যায় বৈষম্যের বিষময় ইতিহাস, যার ছায়া আমাদের সমাজে এখনও ভয়ানক ভাবে বিরাজমান। মেধার যুক্তিতে যাঁরা সংরক্ষণ-বিরোধী, তাঁরা মহাভারতে একলব্যের গল্পটি মনে করতে পারেন। সামাজিক বৈষম্যের পৃথিবীতে মেধাতন্ত্র হয় না। কারণ সুযোগের সমানাধিকার মেধাতন্ত্রের একটি অতি আবশ্যক শর্ত। আমেরিকায় ১৯৬০ সালে ৯৫ শতাংশের উপর ডাক্তার এবং আইনজীবী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ছিলেন। ২০০৮ সালে এই সব পেশায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের অনুপাত কমে হয়েছে ৬০ শতাংশের কাছাকাছি, কারণ শ্বেতাঙ্গ নারীরা এবং কৃষ্ণাঙ্গরা এখন

এই সব পেশায় ঢুকতে পেরেছেন। এখন, ‘শুধু মেধার কারণে আগেকার জমানায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল, নারী বা কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের কোনও ভূমিকা ছিল না’, এমন কথা বোধহয় অতি-দক্ষিণপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পও বলবেন না। ভারতেও ষাটের দশকের গোড়া অবধি প্রশাসনের উচ্চপদে সংরক্ষণ নীতি সত্ত্বেও তফসিলি জাতি থেকে ১ শতাংশের বেশি অফিসার ছিল না। সমস্ত রকম সমীক্ষায় আজও দেখা যায়, উচ্চবর্ণের তুলনায় অনগ্রসর শ্রেণি শিক্ষা, চাকরি এবং আয়, প্রতিটি দিক থেকেই অনেকটা পিছিয়ে।

কিন্তু কথা হল, শুধু সামাজিক বৈষম্যই তো নয়, অসাম্য অনেক রকমের হয়ে থাকে। কেউ বলতেই পারেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য বা লিঙ্গ-বৈষম্য জাতপাতভিত্তিক বৈষম্যের থেকে বৃহত্তর সমস্যা। কিংবা, এমনও ভাবা যেতে পারে যে, সামাজিক ভাবে অনগ্রসর শ্রেণিরা যে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছেন, তার জন্য অর্থনৈতিক অসাম্যের ভূমিকা সামাজিক বৈষম্যের থেকে বেশি। আর সেই জন্যই, হার্দিক পটেলের মতো অনেকেই মনে করেন, সংরক্ষণ নীতি জাতভিত্তিক না হয়ে অর্থনৈতিক অবস্থা-ভিত্তিক হওয়া উচিত। মুশকিল হল, এই অবস্থান জাতভিত্তিক বৈষম্যজনিত অসাম্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, যা বাস্তবসম্মত নয়। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, দুই প্রজন্মের মধ্যে যদি আর্থিক, পেশাগত এবং শিক্ষাগত তুলনা করা হয় (যেমন, বাবা স্বল্পশিক্ষিত হলেও পুত্র উচ্চশিক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা কত), তা হলে খুব সাম্প্রতিক কাল বাদ দিলে, ঐতিহাসিক ভাবে অগ্রসর জাতিদের মধ্যে অনগ্রসর জাতিদের তুলনায় সচলতা অনেক বেশি। অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সব শ্রেণির মধ্যেই অর্থনৈতিক সচলতা বাড়ে, দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরও উন্নতি করার সুযোগ এবং সম্ভাবনা আগের থেকে বেশি হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থানই যদি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তা হলে এই সচলতার হার সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করার কথা নয়। তাই তথ্য-পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু অর্থনৈতিক অবস্থান নয়, অর্থনৈতিক সচলতার পিছনে সামাজিক বৈষম্যের ভূমিকা অগ্রাহ্য করা যায় না। সেই কারণে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপায় হিসেবে সংরক্ষণ নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এ কথা যেমন সত্যি, তেমনই আবার সংরক্ষণ নীতির কিছু মৌলিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। জাতপাত নিয়ে বৈষম্য দূর করতে গিয়ে এমন এক নীতি যদি সমাজের চিরায়ত অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় যার মূল ভিত্তি হল জাতপাত, তা হলে মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার একটা দ্বন্দ্ব বোধহয় থেকেই যায়। এই নীতির প্রয়োগে প্রায় সব ক্ষেত্রেই যোগ্যতার মান সাধারণ শ্রেণির থেকে কম করে ধরা হয়, যা এই শ্রেণির ‘অনগ্রসর’ ভাবমূর্তিটিকে জিইয়ে রাখে। শিক্ষা বা চাকরির ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য যে বাধা সৃষ্টি করে, তার জন্য কয়েক প্রজন্মের ক্ষেত্রে এই নীতির মাধ্যমে ক্রীড়ার মাঠ সমতল করার চেষ্টা সমর্থন করা যেতেই পারে। কিন্তু আদি-অনন্তকাল ধরে এই নীতি বহাল থাকা কাম্য নয়। বরং অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে যাঁরা অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ, তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

নীতিগত দিক ছেড়ে যদি ফলাফলের দিকটি দেখি, তা হলেও কিন্তু মানতে হবে, স্বাধীনতার পর প্রায় সাত দশক ধরে তফসিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য, এবং দুই দশক ধরে অন্য পশ্চাৎপদ শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ নীতি থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের উচ্চপদে ২০১১ সালে তাঁদের সামগ্রিক অনুপাত মাত্র ২৩%, যদিও জনসংখ্যায় তাঁদের অনুপাত প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। কেউ ভাবতে পারেন, তার মানে সংরক্ষণের হার আরও বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষা এবং চাকরির ক্ষেত্রে এই শ্রেণি থেকে যথাসংখ্যক যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়া অনেক সময়েই দুঃসাধ্য, তাই অনেক সংরক্ষিত আসন খালি পড়ে থাকে।

জাতভিত্তিক সামাজিক সচলতা নিয়ে যে সমীক্ষার কথা একটু আগে বলছিলাম, তার থেকে পাওয়া এক চিলতে সুখবর এই যে, গত দুই দশকে অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক সচলতা আগের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে, এখন তা প্রায় অগ্রসর শ্রেণির সঙ্গে তুলনীয়। অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি এবং শিক্ষার সুযোগের বিস্তার এর পিছনে একটা বড় কারণ বলে মনে যেতে পারে। সংরক্ষণের মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণিদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে সচলতার সুযোগ বাড়ানো তাই কৌশল হিসেবে পরিপূরক। এদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা যত কম হবে, যাতায়াতের উপায় যত সীমিত হবে, ভিড় বাস বা ট্রেনে সংরক্ষিত আসন নিয়ে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ ততই বাড়বে। ঠিক একই ভাবে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের হার যত দিন মন্দ গতিতে চলবে, এবং অর্থনৈতিক সচলতার পথ যত বন্ধুর হবে, অগ্রসর জাতিদের মধ্যে সংরক্ষণ নিয়ে অসন্তোষ মাঝে মাঝেই বজ্রনির্ঘোষের মত ফেটে পড়বে।

খটকা লাগতে পারে, এই আন্দোলন বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মত অনগ্রসর রাজ্যে না হয়ে গুজরাতের মত সম্পন্ন ও বর্ধিষ্ণু রাজ্যে হচ্ছে কেন? আসলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাচ্ছন্দ্যের সূচকে বাকি সব রাজ্যের থেকে এগিয়ে থাকলেও, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারে গুজরাত অনেকটা পিছিয়ে। প্রচার বাদ দিলে গুজরাত মডেলের মূল ভিত্তি হলো পুঁজি-নিবিড় ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রকল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভাব স্বভাবত সীমাবদ্ধ।

মোদী সরকারের প্রায় দেড় বছর হতে চলল। এখন অবধি উল্লেখযোগ্য কোনও অর্থনৈতিক সংস্কার রূপায়িত হয়নি, অর্থনীতির পালেও হাওয়া লাগেনি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের কিছু মৌলিক ফাটল ক্রমশই দৃশ্যমান হয়ে পড়ছে সে জন্যই। সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলন এরই উপসর্গ।

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক